Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-III, April 2025, Page No. 19-27
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

হারাধন বৈরাগীর কাব্য সৃজনে পার্বত্য ত্রিপুরার উপজাতি সমাজ জীবন

অমর্ত্য দাস, *অতিথি প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, সরকারী মহাবিদ্যালয় পানিসাগর, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 06.04.2025; Accepted: 24.03.2025; Available online: 30.04.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Haradhan Bairagi (11 October 1964) is a well-loved poet and lyricist in Tripura's literary world. Haradhan Bairagi is a teacher by profession but he is a literary scholar by passion. It is not very easy to talk about soil. But Haradhan Bairagi's poems have the scent of that soil. Although he is a teacher by profession, he has ploughed all the forests, hills and villages of Tripura. He brought up the words of the mountain tribal people. In the writer's writings, the picture of how deprived the hill tribe community is in terms of social, political and economic aspects in the society is revealed. He spent the night at the Jumias' house, eating food from their house. So, in his writings we got various information about the food and life of the tribal people.

Haradhan Bairagi very consciously portrays the small issues of society in his poems on the basis of very large ideals. As we know Tripura is a state of mixed population. It is the traditional tradition of Tripura that one side is at the risk of the other. Haradhan Bairagi roamed all the jungle hills of Tripura. Sees up close the energetic and frenzied life of the people living in the mountains. So, there is no room for imagination in the places or people he talks about in the poems. What he has seen in real life, what has happened to him has been presented in the form of poetry. Haradhan Bairagi touched life in a completely new way. His poems 'Hasmati Tripura' (2017) and 'Khumpuiparay' (2018) have brought out the life portrait of the people thoroughly. The book also describes the forest beauty of Tripura's well-known hilly region Gandachhara and its surrounding areas. As a result, he developed each poem very fluently through language. The experience he got from traveling in real life has been reflected in his poems.

Keyword: Haradhan Bairagi, Tripura, Hill, Social Realism, Culture, Tribal Language, Traditional Cloth, Traditional Food

সাহিত্য এবং সমাজ উভয়ই যেন একই মুদ্রার এপিট আর ওপিট। সাহিত্যের মধ্যে সমাজ ও জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। তাই বলা যায় সাহিত্যে সমাজ জীবনের ছাপ থাকা অবসম্ভাবী। সাহিত্যের সেকাল-একাল প্রদক্ষিণ করলে দেখা যায় প্রতিটি রচনায় কোন না কোনভাবে সমাজজীবন সার্থকভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। পাহাড়ে আবৃত ছোট্ট এই ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। উঁচু নীচু পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নদী যেমন তার গতিপথ বদলায়, ঠিক তেমনি ত্রিপুরার সাহিত্য রচনার ভিত্তিভূমিও নানা সময়ে বাঁক নিয়েছে। আর এই ধারাবাহিক সাহিত্য চর্চার এক নতুন সংযোজিত নাম হলো হারাধন বৈরাগী। লেখক হারাধন বৈরাগীর জন্ম হয় ১৯৬৪ সালের ১১ই অক্টোবর। লেখকের জন্ম হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সিলেট জেলার দিরাই থানার জটি গ্রামে। লেখকের পিতা ছিলেন বনমালী দেবনাথ এবং মাতার নাম প্রভাষিণী দেবী। দেশভাগের পর ক্রমাগত ডাকাতের আক্রমণে পিতৃহারা স্বজনহারা পিতার সাথে মাত্র এক বছর বয়সে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর জেলায় লেখকের আগমন

এবং ধীরে ধীরে উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরের চাকমা জনজাতি অধ্যুষিত পরিবেশেই বেড়ে ওঠা। অক্ষরজ্ঞান এবং হাতেখড়ি হয়েছিল লেখকের মাতা প্রভাষিণী দেবীর হাত ধরে। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পড়াশুনা করে কৈলাশহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে ডিগ্রি অর্জন করে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন এবং নিযুক্তি পান ত্রিপুরা শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক হিসাবে।

বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক হারাধন বৈরাগী পেশায় একজন শিক্ষক হলেও বাংলা সাহিত্য চর্চা এবং সাহিত্য রচনার সাধনায় তিনি সর্বদা নিজেকে সমর্পণ করে রেখেছেন। শিক্ষকতার কাজের সাথে সাথে তিনি রচনা করেছেন বহু কবিতা। তবে হারাধন বৈরাগী শুধুমাত্র কবিতা লেখনীর মধ্য দিয়েই নিজেকে আটকে রেখেছেন তা নয়, তিনি কবিতা রচনার সাথে সাথে রচনা করেছেন বহু গল্প, সমালোচনা গ্রন্থ, গদ্যগ্রন্থ এবং তার রচনায় উঠে এসেছে পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরার পাহাড়ে বসবাস করা উপজাতি জনজাতি অংশের মানুষদের দৈনন্দিন জীবন ও যাপনকথা। জঙ্গল, পাহাড় এবং উপজাতি অংশের মানুষের প্রতি লেখকের যে টান, যে অনুরাগ তা উঠে এসেছে তার বিভিন্ন কাব্য গ্রন্থগুলিতে। তার রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হাসমতি ত্রিপুরা' (২০১৭) এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'খুমপুইপাড়ায়' (২০১৮) গ্রন্থগুলিতে রচিত কবিতাগুলির প্রতিটি আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে আদিবাসী সমাজজীবনের এক নিখুত বাস্তব চিত্র।

পাহাড়প্রেমী লেখক হারাধন বৈরাগী গোটা জীবন ঘুরে বেড়িয়েছেন পাহাড়ে জঙ্গলে এবং আহরণ করেছেন উপজাতি জনসমাজের মুখের ভাষা, তাদের খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, ধর্মীয় রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছেদ, সর্বোপরি তাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে পাঠক মহলকে যেন তিনি উপহার দিয়েছেন এক সত্য নিবন্ধ দলিল। ফলে তার রচিত কাব্য গ্রন্থগুলির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি জনজাতি মানুষদের ভাষার কথ্য ও শুদ্ধ রূপ সচেতন ও অচেতনভাবে ঢুকে গেছে। বাংলা ভাষারও কয়েকটি কথ্য শব্দ এড়ানো যায়নি তার কাব্যগ্রন্থের কবিতা গুলির মধ্যে। সপ্তম শ্রেণীতে পড়াকালীন কবিতা লেখায় হারাধন বৈরাগীর হাতেখড়ি। এমনকি কলেজে পড়াকালীন 'ত্রিপুরা দর্পণে' তিনি ছিলেন একজন নিয়মিত কবিতা লেখক। পরে চাকুরীতে প্রবেশের পর দীর্ঘদিন তিনি লেখালেখিতে অনিয়মিত হয়ে পারেন। যখন ধলাই জেলায় তিনি বদলি হয়ে চলে যান তখন তিনি নতুন করে আবার কবিতা লেখার কাজ শুরু করেন এবং এখান থেকেই তিনি তার হারিয়ে যাওয়া জীবনকে নতুন করে দেখতে পান। তার রচিত গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে তিনি অত্যন্ত সচেতন ও সাবলীলভাবে ভাষা ও ছন্দ রীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ফলে কবিতাগুলোর মধ্যে সমাজের এক অসাধারণ প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে।

পাহাড়প্রেমী ও জঙ্গলপ্রেমী কবি হারাধন বৈরাগী কবিতা লেখায় যেমন নতুনত্বের ছোঁয়া দিয়েছেন তেমনি তার রচনায় তিনি সাবলীল প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বাস্তব জীবনে চলার পথে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা থেকেই তিনি তার সমস্ত সৃষ্টিশৈলীকে শ্রেষ্ঠত্বের আঙিনায় নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করেছেন সে কথা অনায়াসেই বলা যায়। কেননা তিনি তার রচিত 'বুরাসা' গল্পগ্রন্থের গৌরচন্দ্রিকায় লিখেছেন—

> "বুরাসা' গ্রন্থটিতে সংকলিত গল্পগুলি গল্প নাকি গল্পের মতো বলা-অবলা, কী বলা যাবে জানিনা। এ নির্বাচনের দায়িত্ব পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিলাম। সময়কে জানি ভাগ করা যায় না। তবু সময়ের সাথে সাথে তো কিছু ঘটনা ঘটে যায়। কারও কারও মনে অসম্ভব দাগ কাটে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। সেই দাগ থেকে কিছু লেখা হয়ে যায়। ২০১৫ থেকে ২০২০ এই কালখন্ড একটা ভিন্ন যাপনবিন্দু ধরে নাড়িয়ে গেছে আমাকে। এই থেকে আগেও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ও গদ্য লিখেছি। পাঠকরা আমার লেখা ভালোবেসে সাড়াও দিয়েছেন। আর আমার সেই যাপন বিন্দুর অনুভূতি ছুঁয়ে এ ভিন্ন অনুভবের বুদবুদগুলি গল্পের মত যথা সম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমার এই প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বুরাসা'য়।"[১]

সমাজব্যবস্থায় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, প্রেমের প্রতি মানুষের বিষাক্ত মনোভাব, তাছাড়াও হারাধন বৈরাগীর লেখায় উঠে এসেছে জনজাতি মানুষের জীবনযাত্রার ধরন, তাদের অতীত রীতিনীতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সুখ-দুঃখ, আশা ভালবাসা, সংস্কার প্রভৃতি। ফলে তার লেখা কবিতাগুলির ঘটনায় মনে বেদনার উদ্রেক যেমন হয় তেমনি কিছুটা পাঠসুখের অনুভূতিও হয়।

হাসমতি ত্রিপুরা:

লেখক হারাধন বৈরাগীর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ হল 'হাসমতি ত্রিপুরা' (২০১৭)। গ্রন্থটিতে রচিত কবিতাগুলিতে লেখক সমাজের ভালো মন্দ সবদিককেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। প্রেম ভালবাসার অন্তরালে কিছু অসাধু লোক নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে যেভাবে গরিব অসহায় মানুষদের উপর তার জোর খাটায় তাও লেখক হারাধন বৈরাগীর লেখায় উঠে এসেছে। গরিব অসহায় লোকেরা অল্প টাকার লোভে যেকোনো কাজ করতে রাজি হয়ে যায় আর ধনবান, রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের শক্তির ধারা সেই অসহায় মানুষগুলোকে যেমন শোষণ করে তেমন তাদের মানসিক ও শারীরিক সব দিক দিয়ে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এই নিয়ম যেন যুগের নিয়ম, কালের প্রেক্ষিতে আজও এর খুব একটা পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ে না। এদিক দিয়ে হারাধন বৈরাগী তার রচনায় সমাজ ব্যবস্থার যে নিটোল নিদর্শন দিয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হারাধন বৈরাগী প্রকৃতির প্রেমে মত্ত ছিলেন। তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন পাহাড়ের ডালে ডালে, ঘুরে বেড়িয়েছেন পাহাড়ি জনজাতি মানুষদের ঘরে ঘরে। তিনি আহরণ করেছেন তাদের একেবারে ঘরের কথাকে। খেয়েছেন আদিবাসী জনজাতিদের ঘরে রান্না করা খাবার। ফলে তার প্রতিটি কবিতার ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায় সেই আভাস। গোটা পার্বত্য উপত্যকা জুড়ে সংবৎসর যে মহামারী লেগে থাকে তার কারণ কবি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। গরিব ও দুস্থ উপজাতি সমাজের পরিবারে সারা বছরজুড়ে অভাব অনটনের বাতাস বইতে থাকে। তারা কখনো কখনো দিনের পর দিন না খেয়ে কাটিয়ে দেয় আবার কখনো কখনো পাহাড় থেকেই বিভিন্ন ফল মূল সংগ্রহ করে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আর তাদের এই অভাব অনটনের সুযোগ নিয়ে কিছু ধনবান লোকেরা নিজেদের ফায়দা তুলতে ব্যস্ত থাকে। ফলে পাহাড়ি সমাজেও যে শোষণনীতির প্রচলন ছিল কবির কথায় তা উঠে আসে। তিনি বলছেন—

"জগবন্ধু'র মগপাড়ায় গাইহরিণেরা
চুপচাপ ঢুকে পড়ছে হেঁসলের ভেতরে
সাইমার ভাঙ্গনের এতটান—
ফি-দিন তৈরি হয় অগণন চুয়ানবালাই
এই থেকে গোটা উপত্যকা জুড়ে
সংবৎসর লেগে থাকে মহামারি।"[২]

অবুঝ সরল পাহাড়িদের গ্রামে এসে তাদের অভাব অনটনের সুযোগ নেয় শহুরে বাবুরা। তারা এসে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে নিধানের লিফলেট বিলি করে। তারা পাহাড়ি জনজাতিদের সহজ সরল মনোভাবনার সুযোগ নিয়ে তাদের মধ্যে লোভের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। আমাদের কাছে এই বিষয়টি নতুন না হলেও হারাধন বৈরাগীর ভাবনায় তা নতুনত্ব পেয়েছে। কেননা বরাবরের মতো আমাদের চোখেই পড়ে যে শহরের বিত্তবান মানুষেরা গ্রামেগঞ্জে ঘুরে ঘুরে কিংবা পাহাড়ের সহজ সরল আদিবাসীদের ঘরে ঘরে ঘুরে তাদের মধ্যে একটা লোভের টোপ ফেলে। আর পাহাড়িরা সেই লোভের টোপ গিলে ফেলে। কেননা তাদের ঘরে সারা বছর ধরে চলে অভাব আর অনটন। তাই সেই অভাব অনটন থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় তারা শহুরে বাবুদের দেওয়া লিফলেট গ্রহণ করে। তারা ভাবতে থাকে শহুরে বাবুদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ হলে তাদের জীবনে অভাব অনটন বলতে কিছুই থাকবে না। তারাও সুন্দর ও সুখী জীবন যাপন করতে পারবে। ফলে তারা অতি সহজ-সরল হওয়ায় ধনবান ও বিত্তশালী বাবুরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। কবির ভাষায়—

"তাই মাঝে মাঝে নিধানের
লিফলেট নিয়ে এপাড়ায় বাবুরা আসে
আর কমিউনিটি হলের ভেতরে
লুটিয়ে পড়ে গোটা মগপাড়া
.....
ভয়ংকর হতে পারে জেনে,
তাদের পকেটে লোকানো থাকে

কিরাতের জাতক কাহিনী
মাইহরিণেরা নেতিয়ে পড়ে শীতের পরীর কাছে।"[৩]

হারাধন বৈরাগী প্রকৃত অর্থেই মিশে গেছেন একটি আদি জনগোষ্ঠীর আত্মায়। তাই তার কবিতাগুলো পড়লেই মনে হয় একটা দায় যেন আমাদেরও প্রচ্ছন্ন রয়েছে যা প্রকৃত অর্থেই মানুষের বীভৎসতা আর অসহায়তার প্রতি, কোনো ব্যাক্তি বিশেষ বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গোষ্ঠী বিশেষের প্রতি নয়। এই কবির কবিতার প্রখরতা এখানেই—

"এখনও উচ্ছিষ্ট রয়েছে, চলে এসো পার্বণে
হলুদ পাতাদের ক্ষার পানি ঢেলে।
হলুদ জন্মের কথা মৃত্তিকা জানে
জানে কতটুকু চোখে ক্ষার পানি এলে
আচই'র বালিশ ভিজে যায় রাতে।"[৪]

ধর্মের দড়িও ত্রিশঙ্কু হয়ে আছে। রং পাল্টায় কিন্তু অবস্থা পাল্টায় না। তোমার পৃথিবী তোমারই। কোন দেবদূত আসে না অন্ধকার বিমোচনে। পাহাড়িরা আজীবন পাহাড়ের জীবনে বঞ্চিত হয়ে আসছে। সাধারণ জীবন যাপন থেকে তাদের জীবন যেন সম্পূর্ণ আলাদা। সমতলবাসীরা যেসকল সুযোগ-সুবিধা পায় কিংবা যেভাবে জীবন কাটায় তাদের জীবন সেখান থেকে অনেক দূরে। তারাও স্বপ্ন দেখে, তারাও আশার আলোর খোঁজে দিনরাত পরিশ্রম করে কিন্তু তাদের পরিস্থিতির কোন বদল হয় না। তবে তাদের দুঃখ কষ্ট বোঝার মত কেউ নেই।

"জঙ্গলের কোন দুয়ার নেই
চোখ নেই বসতবাড়ির মতো।"[৫]

ইতিহাস সকলেরই জানা তবু কবি সকলকে মনের চোখ খুলে বাইরের জগতকে জানার এবং দেখার আহবান করেছেন। কবি মনে করছেন অতীত ইতিহাস ত্রিপুরার অনেক কিছু মনে করিয়ে দেয় তবু মানুষ মনের চোখ দিয়ে আজও কিছু অনুভব করতে চায় না। এখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সবুজের অভিযান' কবিতাটির কথা মনে পড়ে যেখানে কবিগুরু দেখাতে চেয়েছেন যে সমাজের একশ্রেণীর মানুষ অর্থাৎ যারা বয়সের দিক দিয়ে সমাজের অনেক রূঢ় বাস্তবতার শিকার হয়েছিলেন কিন্তু তারা সমাজের পতন দেখতে পেয়েও ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চান না, তারা চান না কুসংস্কার এবং সামাজিক অবক্ষয়ের পরিবর্তন ঘটে এক নতুন ভোরের সূর্য উদয় হোক। তারা বেঁচে থাকতে চায় সেই একঘেয়েমি জীবন নিয়ে। কবি হারাধন বৈরাগীর কবিতায় সেই দৃশ্য দেখতে পাই যেখানে কবি পাহাড়ি জনজাতি সম্প্রদায়ের সেই সব মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছেন তারা যেন সকল অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এবং তাদের প্রতি যে সামাজিক শোষণ ও অন্যায় বিস্তার লাভ করেছে তার প্রতি তারা যেন প্রতিবাদী কণ্ঠে রুখে দাঁড়ায়।

"খুলে দেখো, মনের চোখে জ্বলছে
রংমশাল, ফিকে হয়ে এলে
বৃক্ষের শিরায় শিরায় অর্বুদ ওঠে
তুমি জানো সেই ইতিহাস।"[৬]

'ত্রিশ' কবিতায় কবি নিজেকে তুলে ধরেছেন একজন জুমিয়া মানুষ হিসাবে। তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা জুম চাষ করে বেড়ান। কেননা তার মধ্যে আছে জীবনের ডাক আর বেঁচে থাকার লড়াই। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলছেন তিনি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন শূকরের চামড়া, কিন্তু ধর্ম নাশের ভয়ে গঙ্গা জলে স্নান করার রীতি কবির মাঝে নেই। কবি আরো বলছেন যে তার মাঝে কান্না নেই, তারা মিলেমিশে নেশা করেন, তাদের মধ্যে স্বর্গারোহনের লোভ নেই, বৈতরণী পাড়ি দেবার সুযোগ নেই, কারণ তাদের কাছে গাভী নেই। ভোরের আলোয় আর মাটির গোলায় কবি লেপে রাখেন কেবল সংশয়।

"স্বর্গারোহন নেই, বৈতরণী নেই, গাভী নেই
শুধু সংশয়, স্মাংলং মাটির গুলায়
লেপে রাখি রাতে, ভোরের আলোয়।"[৭]

বেঁচে থাকার লড়াই চলতে থাকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। অসভ্যতা যেন সভ্যতারই বাই প্রোডাক্ট। শহরে যা ঘটে গ্রামেও তাই ঘটে, জঙ্গলেও একই ধারা। একটি কবিতায় যেন কবি একটি ধর্ষণের কাহিনীকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন কিংবা একটি বিষাদবিধুর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনীকে। 'গাইরিঙ' হচ্ছে পাহাড়িদের অস্থায়ী আবাস, 'আতকারাই' হল জুমের ধান খাবার জন্য আসা পাখি, 'রিসা' হচ্ছে আদিবাসী নারীদের বক্ষবন্ধনী, আর 'ইয়াক্লি' হচ্ছে জুম ঘরে প্রবেশের সিঁড়ি। কবিতায় কবির বলার ভঙ্গিমায় কৌশলে ভেসে উঠেছে এক নিঃশব্দ চিত্র বাঙ্ময়—

"ইয়াক্লি মুখে রক্তের দু'চারটে ফোঁটা
ফসলের শিষে শিষে থমথমে ভাষা।
নিস্পন্দ পড়ে আছে খোপার প্রণয় কাঁটা
ঝরে পড়ছে খড়ের চালা হতে
টুকরো টুকরো তামাটে বেদনা।"[৮]

'চল্লিশ' কবিতায় হারাধন বৈরাগী পাহারিদের বাহারি খাবারের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি যে অত্যন্ত কাছ থেকে জুমিয়াদের দেখেছেন, জুমিয়াদের ঘরের খাবার তিনিও গ্রহণ করেছেন তা সহজেই বোঝা যায়। কেননা তিনি রাত কাটিয়েছেন জনজাতিদের ঘরে। আর আহরণ করেছেন তাদের একেবারে ঘরের কথা।

"আগুনের দমবন্ধ বাঁশের চোঙ
গুতোয় গুতোয় গোদক
লাইরু পাতায় মাইচিকন ভাত।"[৯]

আদিবাসীরা চিরকাল পাহাড়ের বিভিন্ন ফলমূল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। শহর কিংবা নগরের ভোগবিলাসী জীবন যাপন থেকে তারা ছিল শত মাইল দূরে। বিলাসী চালচলন কিংবা খাদ্য গ্রহণ তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের খাবারেও এসেছে পরিবর্তন। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সমানভাবে তাল মিলিয়ে তারাও এখন বাজার থেকে ফলমূল, সবজি কিনে নিয়ে খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। জুমিয়ারা পাহাড় থেকেই তাদের যে খাবার সংগ্রহ করত অর্থাৎ জুম চাষের ফলে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী যেমন জুমের ধান, জুমের তিল, মরিচ, মিষ্টি কুমড়ো, অন্যান্য পাহাড়ি ফলমূল প্রভৃতি। তা থেকে তারা সরে এসে ধীরে ধীরে বাজার সভ্যতা ও নগর সভ্যতার দিকে পা পাড়ায়। তাদের থালায় দেখা যায় এখন রেশনের ভাত, পেঁয়াজ প্রভৃতি। সময়ের পট পরিবর্তনে তারাও নানান ধরনের অলংকার পরিধান করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে —

"কালে কালে পণ্য, অহম অলঙ্কার
চুয়াকতুক ফেরোমন ফাঁদ।"[১০]

জুমিয়ারা কাজ করতে করতে বিশ্রাম নেয় এসে গাইরিঙে অর্থাৎ জুম ঘরে। খাবার হিসাবে তারা গ্রহণ করে শুটকির গোদক, বাঁশের করুল আর কলার মোচা। থালার পরিবর্তে তারা কচি কলার পাতায় করে খাবার মুড়ে নিয়ে আসে এবং তাতেই তারা খাবার গ্রহণ করতেই যেন স্বাচ্ছন্দ বোধ করে—

"নাপ্পির গোদক করুল আর মোচায়
মাইচিকন পাতার মচায়
জঠরে সোহাগ জ্বেলে যায়।"[১১]

জিব্বা জ্বলে যায় তার ঝালে। আবার বলছেন চুয়াকতুক অর্থাৎ এটি হলো এক ধরনের নেশা জাতীয় পানীয়। এটি যেন জুমঘরে রংমহল সাজায়। পোড়া জুমের টিলায় যখন প্রখর রোদ এসে পড়ে কবির উপর তখন কবিপ্রেয়সী হাসমতী গোখড়োর মতো রিসা দিয়ে কবির রোদ আগলে রাখে।

হারাধন বৈরাগী সমতলবাসী একজন লেখক হলেও তিনি ছিলেন জঙ্গলের মানুষ, তিনি আজীবন জঙ্গলে বাস করতে চান। জঙ্গল যেন তার চিরশান্তির আশ্রয়স্থল। তিনি আজন্ম ঝুঁকে আছেন জঙ্গলের উপর। 'ছাপ্পান্ন' কবিতায় দেখা যায় কবির সেই ইচ্ছের প্রকাশ—

"জঙ্গলের মাঝে বাস
ঝুঁকে আছি আজন্ম জঙ্গলের উপর।"[১২]

পাহাড়ের অশিক্ষিত লোকেরা যেভাবে জন্মলগ্ন থেকে আশাবাদের গান শুনে আসছে তার খুব একটা পরিবর্তন আজও আসেনি। লেখক হারাধন বৈরাগী সেই পাহাড়গুলোতে অর্থাৎ আদিবাসী জনজাতিদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি তাদের লাঞ্ছনার জীবন যাপন দেখে বিষাদে কাতর হয়ে উঠেছেন। তাই তিনি তাদের মাঝেই নিজেকে বিলিয়ে দিতে চান। তিনি চান পাহাড়ি আদিবাসীদের চিরাচরিত আশাবাদের বাণী বন্ধ হয়ে তারা বাস্তবতার ছোঁয়ায় সার্থক জীবন যাপন করুক। প্রয়োজনে তিনি আজীবন পাহাড়েই থেকে যাবেন তবু আদিবাসী জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষগুলোর দুঃখ কষ্ট দূরীভূত হোক।

খুমপুইপাড়ায়:

হারাধন বৈরাগীর রচিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ হল 'খুমপুইপাড়ায়' (২০১৮)। প্রাচীন থেকে মধ্য, মধ্য থেকে বর্তমান সমাজে নারীরা বরাবরই বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও পুরুষ শক্তির দ্বারা নির্যাতিত। হারাধন বৈরাগীর 'খুমপুইপাড়ায়' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে সেই দৃশ্য ফুটে ওঠে। সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকারের কথা বারবার উঠে আসলেও প্রকৃত অর্থে নারী ও পুরুষ সমান অধিকারের অধিকারী হতে পারেনি আজও। নারীরা আজও পুরুষদের শক্তির সাথে লড়াই করে উঠতে পারে না। সমাজের একটা অংশের পুরুষ জাতি আজও চায় না নারীরা সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে উঠুক। আজও তারা চায় না নারীরা পুরুষদের সাথে সমানভাবে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করুক। তারা সারা জীবন ধরে জেনে আসছে এটাই যে নারীরা হলো গৃহে সন্তান জন্ম দেওয়ার এবং ঘর কন্যার দায়িত্ব পালন করার বস্তুমাত্র। তাই 'দিলরুবা' কবিতায় কবি বলছেন আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারি কিন্তু শুধুই মোক্ষম মুহূর্তের জন্য। তোমার ঘরের খবর রাখার ক্ষমতা আমার হয়ে ওঠেনি। সমগ্র বনতট আমার জানা আছে কিন্তু রিসার আড়ালে থাকা তোমার সেই ক্ষত আমার জানা নেই। লেখক হারাধন বৈরাগী এখানে অত্যন্ত সচেতন ভাবে সমাজের সেইসব অবহেলিত ও বঞ্চিত নারী জাতির আত্মকথনের ব্যথাকে যেমন অনুভব করেছেন তেমনি কবিতার ভাষায় তুলে ধরেছেন—

"বেরিয়ে আসছে দ্রাক্ষাক্ষত
রিসার আড়াল থেকে।"[১৩]

পাহাড় কিংবা সমতল উভয় সমাজ ব্যবস্থায় অতিথি আপ্যায়নের প্রচলন এ যুগের নয়, তা বহুকাল থেকেই প্রচলিত। 'নগরাই' কবিতায় লেখক হারাধন বৈরাগী অতিথি আসার একটি ইঙ্গিত যেমন দিয়েছেন তেমনি অতিথিদের আপ্যায়ন এবং খাওয়া-দাওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

"মঙ্গলা কলই'র খড়ের চালে
লকলক করছে
সহসা আশ্বস্ত হয়ে উঠি
তকের তকতক আর্তনাদে
মঙ্গলার ঘরে নগরাই এসেছে।"[১৪]

সমাজে ভালো মানুষের পাশাপাশি খারাপ মানুষও যে রয়েছে তা চিরন্তন সত্য। এই সমাজে নারীকে মাতৃরূপে পূজা করার প্রচলন যেমন রয়েছে তেমনি নারীকে অত্যাচার করার মত নিদর্শনও বহুল। 'খুমপুইপাড়ায়' কাব্যগ্রন্থের 'নৈশরাত ও কাকভোর' কবিতায় কবি হারাধন বৈরাগী সমাজের যৌন পিপাসু এক অসভ্য পুরুষের চিত্র যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি সতীত্ব নষ্ট হতে যাওয়া এক নারীর আর্তনাদ তুলে ধরেছেন। রাতের অন্ধকারে যৌন পিপাসু কোন এক যুবক অন্য এক যুবতীর ঘরে প্রবেশ করে তার সাথে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়। তার দেহে নানা ক্ষতবিক্ষত চিহ্ন রেখে যায়। বোঝা যায় সে তার যৌন পিপাসা মেটানোর জন্যই সেই যুবতীর ঘরে প্রবেশ করেছে। কবি শুনতে পান নিশিরাতে অর্থাৎ গভীর রাতে বিছানা থেকে সেই যুবতী ডাকছে পেঁচির মতো অর্থাৎ সে চিৎকার করছে। কিন্তু তাকে উদ্ধার করার মতো কোনো লোক নেই। কেননা বন্ধুর বেশে শত্রুরাও যে আজ সমাজে চিরাচরিত। কবি বলছেন 'চিচিঙের' মতো অর্থাৎ বন্ধুর মতো সেই পুরুষ জুড়ে নেয় তার বিছানা।

"নৈশরাতে বেশ্যা পেঁচির মতো ডাকে

মাঝেমধ্যে গোবরে পোকা
চিচিঙের মতো জুড়ে নেয় বিছানা।"[১৫]

সারারাত ধরে তার উপর চলে অন্যায় আর অকথ্য অত্যাচার। নষ্ট হয় সেই যুবতীর সতীত্ব। কিন্তু বিত্তশালী সমাজ ব্যবস্থায় যে টাকা পয়সার উপর কিছু নেই সে কথা কারোরই অজানা নয়। কাকভোর অর্থাৎ সূর্য ওঠার সাথে সাথে রাংবতাং (টাকার মালা) তার গলায় ঝুলিয়ে তার সতীত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

"কাক আকাশ হাসে খিল খিল
রাংবতাং জড়িয়ে নেমে আসে সতীকুয়াশা।"[১৬]

কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি হারাধন বৈরাগী এই বার্তাই দিয়ে গেছেন যে সমাজে শুভ শক্তির পাশে অশুভ শক্তি আজীবন থাকবে আর শুভ শক্তিকে কালিমালিপ্ত করার জন্যই অশুভ শক্তির জন্ম হয়। নারীর সতীত্ব নষ্ট করতে এগিয়ে আসে যৌন পিপাসু নরখাদক আবার তারাই সতীত্ব ফিরিয়ে দিতে টাকার মালা জড়িয়ে দেয় তাদের গলায়।

এই কবিতা থেকেই কবি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে পয়সার দ্বারা যৌন পিপাসা মেটানোর প্রচলন পাহাড়ি জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রচলন ছিল আর সহজ সরল পাহাড়ি আদিবাসীরা অল্প কিছু টাকার লোভে তারা তাদের শরীর বিলিয়ে দিত পয়সাওয়ালা বিত্তবান যৌন পিপাসু যুবকদের হাতে।

ধনী বিত্তশালী লোকেরা তাদের পয়সার জোড় খাটিয়ে সমাজের গরিব মানুষদের লালসার আহাজারি করে রাখত এটাই যেন যুগের পর যুগ ধরে প্রথায় পরিণত হয়ে গিয়েছে। আদিবাসী জনজাতিরা সহজ সরল, তারা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারেনি ফলে বিত্তশালী ধনবান ব্যক্তিদের ছলচাতুরির ফাঁদে পা দিয়ে এমন বহু যুবতী কিংবা নারী তাদের সতীত্ব নষ্ট করেছে শুধুমাত্র কয়েকটি টাকার লোভে। ভালোভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছে তাদের মধ্যে ছিলনা সে কথা বলা যায় না, তাই হয়তো তারা কয়টি টাকার লোভে নিজেদের শরীর বিলিয়ে বিত্তশালীদের থেকে টাকা আদায় করে ভালোভাবে জীবন যাপন করার স্বপ্ন দেখত। কিন্তু ভাবতো না তারা এর ফলে যে তাদের সতীত্ব নষ্ট হচ্ছে। কেননা সতীত্ব নষ্ট হওয়ার থেকেও তাদের কাছে পেটের ক্ষুধা ও আরাম আয়েশের জীবনযাপন করা অত্যন্ত দামী মনে হয়েছিল।

চির প্রচলিত পৌষ পার্বণের একটি ছোট্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'বুড়িঘর' কবিতায়। আলোচ্য কবিতায় কবি পৌষ সংক্রান্তির সকালে বুড়িঘর জ্বলার বর্ণনা দিয়ে বলছেন—

"বুড়িঘর জ্বলছে
আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছি আমি
পৌষের কুয়াশায় ডানা মেলে ভিজছি।"[১৭]

চারপাশ পিঠের গন্ধে উত্তাল হয়ে উঠেছে। উক্ত কবিতায় কবি 'মামিআউন' অর্থাৎ বিন্নি চালের পিঠের কথা বলেছেন। চিরাচরিত পৌষ পার্বণের প্রচলন যে শুধু সমতলবাসী বাঙালিদের মধ্যেই ছিল তা নয়, সমতলের সাথে সমানভাবে তাল মিলিয়ে পাহাড়ি আদিবাসী জনজাতিদের মধ্যেও পৌষ পার্বণ উদযাপনের প্রথা আজও বর্তমান। তারাও এই দিনটিতে পিঠেপুলির সাথে সাথে বিন্নি ধানের চালের গন্ধে মেতে উঠে—

"চারপাশে ম ম করছে
মামিআউন গন্ধ
মা মামি আউন সেকছেন
বলিরেখা গুলি নীলাভ হয়ে ফুটেছে।"[১৮]

কবি হারিয়ে গেছেন সেই পৌষ সংক্রান্তির সকালের মাঝে। বুড়িঘর জ্বলার আনন্দ আর তার আগুনের যে নীলাভ স্ফুলিঙ্গ তা কবির মননসত্ত্বায় নাড়া দিয়েছে।

'হাসমতি তুমিও' কবিতায় কবির বেদনাহত দৃশ্য ফুটে উঠেছে। পাহাড়ের জঙ্গলে যেন কোন অশুভ শক্তির ইঙ্গিত দিচ্ছেন কবি হারাধন বৈরাগী এই কবিতার মধ্যে দিয়ে। যে জুমের বনে বনপারুকের (জঙ্গলের কপোত সদৃশ পাখি)

ডাক, জুমের বনে ধনেশ পাখির বিকট আওয়াজ শোনা যেত আজ আর কিছুই শোনা যায় না। কবি আরো বলছেন যে গাইরিঙের অর্থাৎ জুমঘরের কোণে যে ময়না শিস দিত সেই ময়না আজ আর আসে না শিস দেয় না। মসক (হরিণ), মসুন্দই (সজারু), বরাহ বনরুই লুকিয়ে লুকিয়ে এখন উঠে আসে রইস্যাবাড়ির বাজারে।

"বনপারুকের ঘুম ঘুম ডাক
ধনেশের বাজখাই আওয়াজ
শোনা যায় না জুমের বনে
হরিয়ালপাখির পাখার বাতাস
শিরশির করে না শীতের মরশুমে
আটকাট আসে না পাখার গানে শস্য কর্তনে
ময়না শিস দেয় না গাইরিঙের কানে
মশক মসুন্দই বরাহ বনরুই
উঠে আসে লুকিয়ে চুরিয়ে
রইস্যাবাড়ির বাজারে।"[১৯]

পশু পাখির আশ্রয়স্থল হলো জঙ্গল, জঙ্গলেই তাদের বসবাস, জীবন যাপন। তারা চলে এসেছে লোকালয়ে তাও একেবারে বাজারে। কবির এই ব্যঞ্জনাময় কবিতা থেকে বোঝা যায় যে জঙ্গলের বর্তমান অবস্থার অবনতি হতে শুরু হয়েছে, পশুপাখিরা এখন আর জঙ্গলে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারছে না তাই তারা জঙ্গল ছেড়ে জনবহুল এলাকায় চলে আসছে। এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় কবির কথা থেকে—

"ভালুকও ভালো নেই কিরাতের জঙ্গলে
মায়ুঙের পিঠ ঠেকে গেছে লংতরাই'র
দেয়ালে, তারাও প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।"[২০]

সময়ের পট পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে জঙ্গলে আদিবাসীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। যে পাহাড় জঙ্গল তাদের বেঁচে থাকার প্রেরণা, যে জঙ্গলকে তারা মাতৃরূপে সারাক্ষণ আগলে রাখে সেই জঙ্গলে আজ অশুভ শক্তির দৃষ্টি নিক্ষেপ হয়েছে। তারা বুঝতে পারছে জঙ্গলে পশুপাখি সহ তাদেরও টিকে থাকা অসম্ভব কেননা পাহাড় জঙ্গলে রাতে বনদস্যুদের উপদ্রব বেড়েছে। প্রতিরাতে জঙ্গলের বড় বড় গাছগুলো কেটে নিয়ে যায় বনদস্যুদের দল। আর জঙ্গলের নানা জীবজন্তু ক্রমশ তাদের আশ্রয় হারায়। পশু পাখির আশ্রয়স্থলই হলো জঙ্গল এবং সেই জঙ্গলে বনদস্যুদের উপদ্রব যেহেতু বেড়েছে সেহেতু এই পাহাড় জঙ্গল যে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তার ইঙ্গিত পেয়েছেন লেখক হারাধন বৈরাগী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এভাবে চলতে থাকলে মানুষের বসবাসের আশ্রয়স্থল একদিন জীবজন্তুরা দখল করে নেবে, কেননা তারাও সর্বক্ষন বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সামিল—

"সচুতুর শেয়াল আর মুখরা
মিশে গেছে মানুষের মিছিলে
বাঘ ঘাপটি মেরে আছে গাইরিঙের কাছে।"[২১]

গাইরিঙ (জুমঘর) হচ্ছে জুমিয়াদের বাসস্থান। কিন্তু এই জুমঘরে আজ আর মানুষ থাকে না তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লেখকের কথায় কেননা যে জুমঘরে মানুষ থাকতো আজ সেই ঘরের পাশেই বাঘ ঘাপটি মেরে বসে আছে। অর্থাৎ যে জুমঘর মানুষের বাসস্থান সেখানে বন্য জন্তু জানোয়ারেরা আশ্রয় খোঁজতে ব্যস্ত।

এভাবেই কবি হারাধন বৈরাগী তার কাব্যগ্রন্থগুলির সমগ্র পটভূমি জুড়ে তুলে এনেছেন পাহাড়ি আদিবাসী জনজাতিদের জীবন বৃত্তান্ত। তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন পাহাড়ে পাহাড়ে, জঙ্গলে জঙ্গলে, আহরণ করেছেন জনজাতিদের নানান সমস্যা, তাদের জীবনযাপন, সংস্কৃতি প্রভৃতি। তিনি শিক্ষকতার চাকরির সুবাদে ধলাই জেলার জগবন্ধুপাড়ায় বদলি হয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন আদিবাসী জনজাতিদের গ্রাম ঘুরে ঘুরে যে সমাজ বাস্তবতার সাক্ষী হতে পেরেছিলেন, আদিবাসীদের গ্রামে ঘুরে ঘুরে যা দেখতে পেয়েছেন এবং জানতে পেরেছেন তাকেই তিনি তার সৃষ্টিশীল সাহিত্য সৃজনে জায়গা করে দিয়েছেন। ফলে তার রচনার সমস্ত আঙিনা জুড়ে আদিবাসী জনজাতিদের মুখের কথ্য ভাষা

কোথাও কোথাও সরাসরি উঠে এসেছে। আবার ভাব, ভাষা বিচার এবং শব্দের ভঙ্গিমা প্রভৃতি হারাধন বৈরাগীর লেখনীতে অত্যন্ত সাবলীল হয়ে উঠেছে যেখানে লেখক হারাধন বৈরাগীর সহজ সরল বয়নরীতির স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। যা পাঠক মহলে এক অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে দেয়।

তথ্যসূত্র:

১) বৈরাগী হারাধন, বুরাসা, তিনকাল প্রকাশনা, আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃষ্ঠা নং: গৌরচন্দ্রিকা
২) বৈরাগী হারাধন, হাসমতি ত্রিপুরা, স্রোত প্রকাশনা, কুমারঘাট হালাইমুড়া ঊনকোটি ত্রিপুরা ৭৯৯২৬৪, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা নং: ৩১
৩) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ৩১
৪) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ৩৫
৫) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ৩৫
৬) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ৩৫
৭) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ৩৬
৮) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ৪১
৯) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ৪৬
১০) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ৪৬
১১) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ৫৯
১২) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ৬০
১৩) বৈরাগী হারাধন, খুমপুইপাড়ায়, তুলসী পাবলিশিং হাউস, আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা, বইমেলা ২০১৮, পৃষ্ঠা নং: ১৫
১৪) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ২১
১৫) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ২৩
১৬) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ২৩
১৭) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ২৬
১৮) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ২৬
১৯) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ২৭
২০) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ২৭
২১) তদেব, পৃষ্ঠা নং: ২৭

গ্রন্থপঞ্জী:

১) বৈরাগী, হারাধন, বুরাসা, তিনকাল প্রকাশনা, আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারি ২০২১
২) বৈরাগী, হারাধন, হাসমতি ত্রিপুরা, স্রোত প্রকাশনা, কুমারঘাট হালাইমুড়া ঊনকোটি ত্রিপুরা ৭৯৯২৬৪, ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৩) বৈরাগী, হারাধন, খুমপুইপাড়ায়, তুলসী পাবলিশিং হাউস, আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা, বইমেলা ২০১৮